‘বাজারে যে পানির দাম বিশ টাকা আমরা সেই পানি আট টাকায় বিক্রি করবো’

ড. কে আজহারুল হক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক , ঢাকা ওয়াসা

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : **আসাদুর রহমান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : পানির চাহিদা এবং ওয়াসার সরবরাহ ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য কতটা?

কে আজহারুল হক : বর্তমানে ঢাকা শহরে ১ কোটি লোকের বসবাস। দৈনিক পানির চাহিদা প্রায় ১৬০ কোটি লিটার। এই চাহিদার বিপরীতে আমরা বর্তমানে ১৪৮ থেকে ১৫০ কোটি লিটার পানি প্রতিদিন সরবরাহ করছি। ১০ থেকে ১২ কোটি লিটার পানি প্রতিদিন ঘাটতি থাকছে।

২০০০ : এই ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে আপনাদের কি পরিকল্পনা রয়েছে?

আ. হক : এই ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে আমাদের দু'রকমের পরিকল্পনা আছে। একটি হলো অতিসত্বর এই ঘাটতি পূরণ করার ব্যবস্থা করা। অন্যটি কিছুটা দীর্ঘমেয়াদি। সেটা হলো প্রতি বছর ঢাকা শহরে পানির চাহিদা বাড়ছে ৬/৭ ভাগ হারে। এই বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের একটি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা আছে। যেটা স্বল্পমেয়াদি তা পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পানি সরবরাহ পরিস্থিতি সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন নামক একটি প্রকল্প সরকার অনুমোদন করেছে এবং ১ জুলাই থেকে এটি কার্যকর হয়েছে। আগামী ১ বছরের মধ্যেই আমাদের যে ঘাটতি রয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে তা পূরণ করতে পারবো। কিন্তু যে চাহিদাটা বাড়ছে তা পূরণে আমরা পাগলায় একটি পানি শোধনাগার নির্মাণ করার ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা করেছি। আমাদের মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি যে দুটি পরিকল্পনা রয়েছে তা ২০১০ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে এবং এর জন্য অন্তত আমাদের তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। একটি হলো, পাগলায় একটি পানি শোধনাগার স্থাপন করতে হবে। সায়েদাবাদে পানি শোধনাগারের দ্বিতীয় পর্যায় এবং সায়েদাবাদের তৃতীয় পর্যায়। এই তিনটি পানি শোধনাগার আমাদের নির্মাণ করতে হবে। পাগলায় দৈনিক প্রায় ৪৫ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পানি শোধনাগারের জন্য কাজের পরিকল্পনা নিয়েছি। এর দরপত্র এখন মূল্যায়ন পর্যায়ে রয়েছে। আর সায়েদাবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে যে পানি শোধনাগার হবে সে জন্য আমরা ডেনমার্ক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। তারা নীতিগতভাবে রাজি হয়েছে যে, এই প্রকল্প তাদের ঋণ পাওয়ার যোগ্য। তবে তারা সরকারের কাছে কিছু শর্ত দিয়েছে, শর্তগুলো পালনসাপেক্ষে তারা ঋণ দেবে বলে জানিয়েছে। সে কাজও এগিয়ে চলছে। আর সায়েদাবাদের যে তৃতীয় পর্যায় সে জন্য আমরা সুইডিশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা প্রাথমিকভাবে এটা পরীক্ষা করে দেখছেন, এই কাজ করা যায় কি না।

২০০০ : দেশে পানির রমরমা ব্যবসা চলছে । বিভিন্ন কোম্পানি উচ্চ মূল্যে পানি বিক্রি করছে। এক্ষেত্রে আপনাদের কোনো পরিকল্পনা আছে কি না?

আ. হক : ঢাকা শহরে দু'ভাবে পানি উত্তোলন করা হয়। একটি হলো ভূগর্ভস্থ পানি। এটি মাটির ৫০০ ফুট নিচ থেকে উত্তোলন করা হয়। ভূগর্ভের পানি সবচেয়ে বেশি সরবরাহ করা হয়। প্রায় ৮৩ ভাগ পানি আসে ভূগর্ভস্ত থেকে। আর ১৮ ভাগ পানি আসে নদী থেকে। নদীর পানি আসে চারটি পানি শোধনাগারের মাধ্যমে। পুরনো ঢাকার লালবাগের চাঁদনীঘাট, নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল ও সোনাকান্দা আর সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারে নদীর পানি আসে। সায়েদাবাদ থেকে আমরা প্রতিদিন সাড়ে ২২ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি পাই। এই চারটি শোধনাগার থেকে উত্তোলিত পানি বিশুদ্ধ। এই পানিটা যখন আমাদের লাইনে গিয়ে গ্রাহকের জলাধার হয়ে গ্রাহক যখন ব্যবহার করেন তখন বিভিন্ন জায়গায় পানি দূষিত হয়। আমরা একটি সমীক্ষায় দেখেছি যে, লাইনের মধ্য দিয়ে পানি সরবরাহের সময় পানি দূষিত হয় ৩০%। এরও বিভিন্ন কারণ আছে। আর বাকি ৭০ ভাগ দূষিত হয় গ্রাহকের জলাধারে ও তার বাড়ির ছাদের ট্যাংকে। সে কারণে আমরা যতই বিশুদ্ধ পানি তৈরি করি না কেন, পানি যখন বিভিন্ন মাধ্যম হয়ে গ্রাহকের কাছে পৌঁছায় সেই মাধ্যমগুলোতে পানি দূষিত হয়। ওয়াসার পানি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রাখা সম্ভব হলে ঢাকার লোকদের ২০ টাকা দিয়ে ১ লিটার পানি কিনতে হতো না। আর এ জন্যই আমরা বোতলজাত পানি সরবরাহের কথা ভাবছি।

২০০০ : আপনাদের বোতলজাত পানি কী পুরোপুরি বিশুদ্ধ হবে?

আ. হক : প্ল্যান্টের পানি ও বোতলজাত পানির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকবে। আমরা বর্তমানে যে পানিটা শোধন করি তা জীবাণুমুক্ত করার জন্য ক্লোরিন গ্যাস ব্যবহার করি। এই ক্লোরিনের সামান্য গন্ধ পানিতে থেকে যায়। সুতরাং এই ক্লোরিন গ্যাস দিয়ে পানি বিশুদ্ধ করে বোতলজাত করা হলে তা মানুষ গ্রহণ করবে না। এজন্য বোতলজাত পানিতে আমরা ক্লোরিনের বদলে ওজন গ্যাস দিয়ে জীবাণুমুক্ত করবো। ওজন গ্যাসের কোনো গন্ধ নেই, রঙ নেই। ওজন গ্যাস ব্যবহারের ফলে বোতলের এই পানি অন্তত ১ বছর খাওয়ার উপযোগী থাকবে। কিন্তু ক্লোরিন গ্যাসে তা থাকবে না। আমাদের বোতলজাত পানি বিশুদ্ধ হবে।

২০০০ : বাজারে যে পানি পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে এই পানির পার্থক্য কি হবে?

আ. হক : বাজারে বর্তমানে ২৫ থেকে

৩০টি কোম্পানি পানির ব্যবসা করছে। বিভিন্ন টেস্ট রিপোর্ট, সংবাদপত্র থেকে আমরা যে রিপোর্ট পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে, এদের বেশির ভাগই পানি বোতলজাত করার যে নিয়ম রয়েছে তা অনুসরণ করছে না। ৯০% বোতলজাত পানিই যেসব নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন তা করছে না। দ্বিতীয়ত আমরা মনে করি, বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে পানি পাওয়া যায়। শীতকালে পানির স্তর কমে যাওয়ায় পানির প্রাপ্যতা কম হয়। আমরা যে পানি বোতলজাত করবো তা এক বছর সংরক্ষণ করা যাবে। ফলে বর্ষাকালে যখন আমরা প্রচুর পানি পাবো তখন তা বিশুদ্ধ করে বোতলজাত করে রাখতে পারবো। অন্যদিকে বাজারে ১ লিটার ডিজেল আর ১ লিটার বোতল পানির বর্তমান দাম সমান। বাজারে পাওয়া যায় মিনারেল ওয়াটার। কিন্তু আমরা সাপ্লাই করবো শুধু বিশুদ্ধ পানি। মিনারেল ওয়াটারের জন্য পানিতে কিছু উপাদান দিতে হয়। আমরা আমাদের পানিতে সে উপাদানগুলো দিচ্ছি না। বাজারে যারা মিনারেল ওয়াটারের কথা বলে ব্যবসা করছে তাদের সবার পানিও আসলে মিনারেল ওয়াটার নয়। তাছাড়া আমাদের জন্যে মিনারেল ওয়াটারের খুব বেশি প্রয়োজনও নেই। আমাদের জন্যে প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানি। মিনারেল ওয়াটারের যে উপাদান থাকার কথা সেগুলো অন্যান্য খাবারেও থাকে। আমরা সামান্য মূল্যে মানুষকে বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে চাই।

২০০০ : আপনারা যে বোতলজাত পানি সরবরাহ করবেন তার দাম কত হবে?

আ. হক : আমরা প্রাথমিকভাবে দু'ধরনের বোতল বাজারজাত করবো। একটি হাফ লিটার, অন্যটি হলো ১ লিটার। শুরুতে আমরা ১ লিটারের বোতল বাজারে ছাড়বো। ১ লিটারে আমাদের তৈরি খরচ পড়বে ৬.৪৫ টাকার মতো। এতে বোতলের দাম সবচেয়ে বেশি। কারণ এই বোতল হবে ফুড গ্রেডেড। পানির দাম পড়বে দেড় পয়সা আর বোতলের দাম পড়বে ৩.১৫ টাকা। আমরা আশা করছি, এটি বাজারে গিয়ে ৮ টাকার মধ্যে বিক্রি হবে। বিশুদ্ধ পানি খাওয়া মানুষের নাগরিক অধিকার। বাজারে বোতলে যে পানি পাওয়া যাচ্ছে তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। আমরা বোতলজাত পানিকে নিম্ন মধ্যবিত্তের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনতে চাই। বাজারে যে পানির দাম বিশ টাকা আমরা সেই পানি আট টাকায় বিক্রি করবো। আমরা প্রাইভেট সেক্টরের রেগুলেটার হিসেবে কাজ করবো- যাতে প্রাইভেট কোম্পানিগুলো তাদের ইচ্ছে মতো পানির দাম বাড়াতে না পারে।

২০০০ : বাজারে কবে থেকে এই পানি পাওয়া যাবে?

আ. হক : আমাদের টার্গেট আগামী ১ জানুয়ারি থেকে এই পানি বাজারজাত করবো। আমাদের কতোগুলো ধাপ অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। যেমন : এক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য আমাদের বোর্ডে অনুমোদন নিতে হয়, বোর্ড নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছে, কিন্তু যেহেতু এই বিনিয়োগটা ওয়াসা নিজস্ব অর্থায়নে করবে, প্রথম পর্যায়ে এই প্রকল্পে ২ কোটি ৮৮ লাখ টাকা ব্যয় হবে, ফলে বোর্ড থেকে একটি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো অনুমোদন নিতে হবে কিনা। এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে।

২০০০ : কাজটি কি আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে আটকে যাবে নাকি দ্রুত এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে?

আ. হক : মাননীয় মন্ত্রী এল. কে. সিদ্দিকী আমাদের কাজটি ৩ মাসের মধ্যে শেষ করতে বলেছিলেন। আমরা চাচ্ছি জানুয়ারির মধ্যে পানি বাজারে নিয়ে আসতে।

২০০০ : আপনারা প্রতিদিন কত বোতল পানি প্রক্রিয়াজাত করবেন?

আ. হক : আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতি ঘন্টায় ১০ হাজার লিটার পানি প্রক্রিয়াজাত করা। ফলে ৫ হাজার হবে ১ লিটারের বোতল আর ১০ হাজার হবে হাফ লিটারের বোতল। ২ শিফটে কাজ চলবে। ফলে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার বোতল হবে হাফ লিটারের আর ৮০ হাজার বোতল হবে ১ লিটার। ফলে প্রতিদিন আমরা ২ লাখ ৪০ হাজার বোতল পানি প্রোডাকশন করতে পারবো। তবে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের প্রোডাকশন বাড়াতে পারবো। আমরা প্রথমে ঢাকা শহরে এই বোতলজাত পানি বাজারে ছেড়ে দেখবো এটি লোকজন কতোটুকু গ্রহণ করছে।

২০০০ : বোতলজাত পানির কি পরিমাণ চাহিদা আছে- এ নিয়ে আপনাদের কোনো সার্ভে রয়েছে কি?

আ. হক : এ নিয়ে আমাদের কোনো সার্ভে নেই। আমাদের টার্গেট হলো মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যারা দাম কম হলে বোতলজাত পানি ব্যবহার করবে।

২০০০ : আপনাদের এই পানি কোথা থেকে টেস্ট হবে?

আ. হক : আমরা যে প্ল্যান্ট করবো তা মোটামুটি অটোমেটিক প্ল্যান্ট হবে। তাছাড়া সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের পাশেই আমাদের নিজস্ব একটি পরীক্ষাগার রয়েছে। সেখানে আমরা প্রতি ঘন্টায় পানি টেস্ট করি। সেখানে আমরা পানি টেস্ট করবো। এটা আমাদের নিজস্ব। আর বাইরে থেকেও আমরা ধারাবাহিকভাবে টেস্ট করবো। আণবিক শক্তি কমিশন, বুয়েট বা সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে নিরপেক্ষ পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করবো। তাছাড়া সরকারের যে নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরগুলো আছে যেমন : বিএসটিআই, পরিবেশ

'আমাদের জন্যে মিনারেল ওয়াটারের খুব বেশি প্রয়োজনও নেই। আমাদের জন্যে প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানি'

অধিদপ্তর তাদের জন্যেও আমাদের পানির এই প্ল্যান্টটি খোলা থাকবে। তারা যেকোনো সময় এসে পরীক্ষা করে দেখবেন যে, পানির গুণগত মান ঠিক আছে কিনা। আমরা এই পানি বিশুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইড লাইন অনুসরণ করবো।

২০০০ : কিছু সংবাদপত্রে সায়েদাবাদের প্ল্যান্টের পানিকে দূষিত বলে উল্লেখ করছে- এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

আ. হক : আমি বলবো এই রিপোর্টিংগুলো ঠিক নয়। কেননা প্ল্যান্টে এখনও বিদেশী বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন। তারাও টেস্ট করছে, আমরাও টেস্ট করছি। তাতে আমি বলতে পারি সায়েদাবাদ প্ল্যান্ট থেকে যে পানি সরবরাহ করা হয় তা পূর্ণমাত্রায় বিশুদ্ধ। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, প্ল্যান্ট থেকে পানি যখন লাইনে আসে তখন তা দূষিত হয়ে পড়ে। আমাদের কিছু লাইন আছে পুরনো। সেগুলোর সংস্কার কাজ চলছে। সায়েদাবাদ প্ল্যান্ট স্থাপনের আগে প্ল্যান্ট থেকে পানি সরবরাহকৃত এলাকায় পানির চাপ কম ছিল। ফলে লিকেজ হবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন প্রেসার বেড়ে যাওয়ার ফলে পাইপের যে জায়গায় দুর্বলতা আছে সেখানে কিছু লিকেজ হচ্ছে। তবে তা আমরা ঠিক করে দিচ্ছি।

২০০০ : শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যাবে। তখন পানির প্রাপ্যতা কম হলে ঢাকাবাসীর চাহিদা কিভাবে মেটাবেন?

আ. হক : শুষ্ক মৌসুমে– মাটির নিচের পানির স্তর নিচে নেমে যায়, আর নদীর পানি কমে যাওয়ায় পানিতে দূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। তখন পানি সংগ্রহ এবং দূষণমুক্ত করা ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। তবে আমাদের পানি উত্তোলনের যে নকশা তাতে শুষ্ক মৌসুমে পানির পরিমাণে কোনো সমস্যা হবে না। শুধুমাত্র পানি বিশুদ্ধ করতে বেশি কেমিক্যাল ব্যবহার হওয়ার জন্য খরচ কিছুটা বাড়বে। সে জন্য বোতলজাত পানির ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করবো, বর্ষা মৌসুমে যত বেশি পারা যায় বোতলজাত পানি সংগ্রহ করে রাখার। এতে বোতলজাত পানিতে শুষ্ক মৌসুমে অতিরিক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হবে না। ফলে বোতলজাত পানির দাম বাড়বে না।